তাহা জাবির আলআলওয়ানি

ইসলামে স্বধর্মত্যাগ

একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

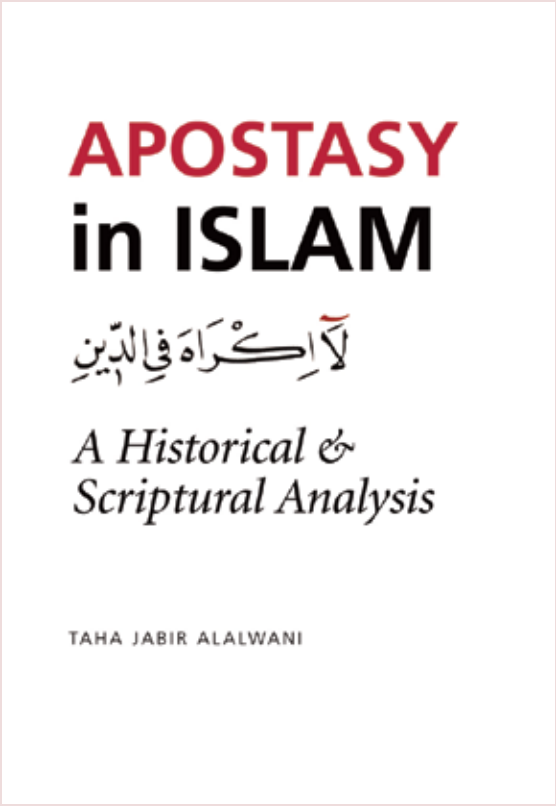

ইসলামে স্বধর্মত্যাগ

একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

তাহা জাবির আলআলওয়ানি

আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ
ন্যান্সি রবার্টস

সংক্ষেপণ
এলিসন লেক

বাংলা অনুবাদ
হারুন ইবনে শাহাদাত

সম্পাদনা
আহমদ হোসেন মানিক

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ইসলামে স্বধর্মত্যাগ

একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

তাহা জাবির আলআলওয়ানি

অনুবাদস্বত
বিআইআইটি

প্রকাশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২, বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (৩য় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩৯৪৯, ০১৪০০ ৪০৩৯৫৮

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর, ২০২৩

মূল্য
১২৫.০০ টাকা

আইএসবিএন
৯৭৮-৯৮৪-৯৬৭৩১-৯-৪

Bengali version of *'Apostasy In Islam: A Historical and Scriptural Analysis'*. published by BIIT Publications; 302, Books and Computer Complex Market (2nd Floor), 38/3, Banglabazar, Dhaka-1100; Cell: (+88) 01400 403949, 01400 403958, E-mail: biitpublications@gmail.com, publication: September 2023. Price: Tk 125.00

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজ

আইআইআইটি সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ সিরিজের গ্রন্থগুলো পাঠকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার উৎসমূল ঠিক রেখে, পরিকল্পিত ও সংক্ষিপ্ত আকারে মূল ধারণাকে বুঝার উপযোগী করে। গ্রন্থগুলো সহজে ও কম সময়ে পড়ার উপযোগী করে সংক্ষিপ্ত আকারে পাঠকের কাছে উপস্থাপন করা হয়। বিস্তারিত প্রকাশনাকে খুব সতর্কতার সাথে গভীরভাবে বার বার দেখার পর সারসংক্ষেপ করা হয় এ আশা নিয়ে যে, পাঠকের মনে উল্লেখিত বিষয়ে জানার আগ্রহ সৃষ্টি হবে।

স্বধর্মত্যাগের (*আল-রিদ্দাহ*) জন্য নির্ধারিত আইনানুগ শাস্তি যদি থাকে তাহলে তা কী এবং কুরআনের ২:২৫৬ আয়াতে বর্ণিত 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' অনুযায়ী তার প্রতি ধর্ম কতটুকু সহনশীলতা দাবি করে?

উল্লেখিত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ তাহা জাবির আলআলওয়ানির গভীর অধ্যয়ন ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার ফসল 'ইসলামে স্বধর্মত্যাগ: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ'। গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১১ সালে। এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য, রাসূল সা. স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগের জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেননি। অথচ পরবর্তী শতাব্দীতে এ বিষয় নিয়ে মুসলিম বিশ্বে অব্যাহত বিতর্ক দুঃখজনক। সংবাদ মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে নেতিবাচক প্রচারণা ইসলামি আইনশাস্ত্রকে মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চরম বিরোধী অবস্থানে দাঁড় করিয়েছে।

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক যথাযথভাবে গভীর মনোযোগের সাথে চুলচেরা বিশ্লেষণ করে এ বিষয়ের তথ্য পরীক্ষিত মূল উৎস থেকে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলো বিস্তারিত এবং এর সাথে সম্পর্কিত অনেক নৈতিক ও প্রাসঙ্গিক বিষয় প্রমাণ একত্রিত করেছেন। তিনি মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের প্রবক্তাদের বিরোধপূর্ণ যুক্তিতর্ক পেশ করেছেন এবং তার বিরুদ্ধে যুক্তি তুলে ধরেছেন। লেখক কুরআন, সুন্নাহতে উল্লেখিত সমুন্নত বিশ্বাসের স্বাধীনতার

পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। তিনি ইসলাম (বিশ্বাস) থেকে বের হয়ে যাওয়াসহ *আল-রিদ্দাহ* পাপের জন্য মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন না। পাপ শব্দটির প্রতি মনোযোগ দিয়ে বলা হয়েছে, এর জন্য অপরিহার্য শর্ত আছে : যতদিন একজন স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগকারী বিচারযোগ্য অন্য কোনো অপরাধের সাথে জড়িত না হবেন, বিশেষভাবে জাতীয় নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত অপরাধের সাথে জড়িত না হবেন, লেখকের মতে ততদিন বিষয়টি শুধু আল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কুরআন একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস ত্যাগের পর বার বার ফিরে আসার সুযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, তাদেরকে হত্যা করা উচিত কিংবা শাস্তি দিতে হবে এমন কথা বলেনি– লেখক এ সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। ইসলামের শিক্ষা হলো, সৃষ্টিকর্তার ইবাদতের জন্য মানুষ তার ধর্ম পছন্দ করার ব্যাপারে স্বাধীন। মূলনীতি হলো, মানুষের জন্য এটি এমন এক গুরুদায়িত্ব যার জন্য সে নিজেই দায়ী থাকবে, এজন্য সে অন্য কাউকে দায়ী করতে পারবে না। তার এ পছন্দের ভুল-শুদ্ধের বিচার হবে পরকালে, ইহকালে নয়।

গ্রন্থটি লেখা হলো এক বড় জটিল ও দুর্বল সময়ে যখন কুরআন এবং সুন্নাহর উচ্চতর আইনগত উদ্দেশ্য ও মান বা *মাকাসিদ আল-শরিয়াহ* বুঝা একান্ত প্রয়োজন। লেখক তাঁর এ গবেষণায় জোরালো শক্তিশালী প্রমাণ ও পরীক্ষা পদ্ধতির মাধ্যমে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কুরআন ও নির্ভরযোগ্য হাদিস, বিবেচনাযোগ্য চিন্তা, ইসলামি পাঠগত বিজ্ঞান গবেষণা ও প্রথাগত পন্থা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে জ্ঞান, সেই সাথে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের যথাযথ ব্যবহার করেছেন।

কুরআনের নির্দেশানুসারে, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো জীবন নেয়া সমস্ত মানব জাতিকে হত্যা করার শামিল। সুতরাং ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থের সাথে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা। এ বিষয়টি স্বচ্ছভাবে সবার উদ্দেশে তুলে ধরা হয়েছে।

মূল বইয়ের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ

ইসলামে স্বধর্মত্যাগ: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ

তাহা জাবির আলআলওয়ানি

সূচি

ভূমিকা ॥ ০৭

প্রথম অধ্যায়
ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ? ॥ ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়
স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য ॥ ১৬

তৃতীয় অধ্যায়
রাসূল সা.-এর সময়ে স্বধর্মত্যাগ ॥ ১৯

চতুর্থ অধ্যায়
স্বধর্মত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় মৌখিক সুন্নাহর বক্তব্য ॥ ২২

পঞ্চম অধ্যায়
ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে স্বধর্মত্যাগীদের শাস্তি ॥ ২৫

ষষ্ঠ অধ্যায়
স্বধর্মত্যাগে অভিযুক্ত মুসলিম স্কলারগণ ॥ ৩১

উপসংহার ॥ ৩৪

টীকা ॥ ৩৬

ভূমিকা

এ গবেষণার লক্ষ্য স্বধর্মত্যাগের জন্য আইন নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে ঐকমত্যের যে অভাব রয়েছে তার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখানো। স্বধর্মত্যাগ পরিভাষাটি কুরআন এবং সুন্নাহয় কোন বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা স্পষ্ট করা। এ প্রসঙ্গে নবী স.-এর কথা ও কাজ যা সংশ্লিষ্ট হাদিসসমূহ থেকে আমরা পেয়েছি এবং প্রথা ও আচার-আচরণ, জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচিত, তাঁর সাহাবিদের যতটুকু মূল্যায়ন আমাদের জন্য অনুমোদিত, স্বধর্মত্যাগের ব্যাপারে এমন যেখানে যত তথ্য প্রমাণ আছে তার কোথাও আইন নির্ধারিত নির্দিষ্ট শাস্তির বিধান নেই যতদিন না কেউ ইসলাম ত্যাগ করে ভিন্ন বিশ্বাস গ্রহণ করার সাথে অন্য কোনো অপরাধমূলক কাজের সহযোগী না হবেন। প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও ব্যবহারিক সুন্নাহ মানুষের জন্য বিবেচ্য তাদের সব ইচ্ছা, অভিমত, চিন্তা, মনোভাব, কাজের স্বাধীনতাকে সমর্থন করে।

এ লক্ষ্যে অধ্যয়নটি বিভিন্ন মজহাবও বিশ্লেষণ করে, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম আইনবিদরা দাবি করে যে ধর্মত্যাগীকে অবশ্যই মৌখিক সুন্নাহ এবং ঐকমত্যের ভিত্তিতে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে। এ গবেষণা পদ্ধতিতে দার্শনিক, বিশ্লেষণাত্মক এবং গবেষণার ঐতিহ্যগত ও ঐতিহাসিক পদ্ধতিগুলো ইসলামি পাঠ সম্পর্কিত জ্ঞান এবং এ সংক্রান্ত জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের প্রথাগত পন্থায় প্রস্তাব করা হয়েছে। কুরআন হলো সব রায় বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের মৌলিক নীতিমালার প্রধান উৎস ও ভিত্তি। কুরআনের অর্থ ব্যাখ্যা করার উৎস হিসেবে সুন্নাহকে একটি বেঁধে দেয়া পদ্ধতি বিবেচনা করা হয়।

কুরআনে দেখানো ভাষাগত পারিভাষিক অর্থ নির্ধারণে যেসব মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়েছে তা হলো : কুরআনের নিজস্ব পরিভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, সুন্নাহতে আছে রাসূল স.-এর এমন ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য এবং আরবে প্রচলিত সেসব পরিভাষা যা তাদের বিভিন্ন উপভাষায় সাহিত্যশৈলী ও

অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যবহার করা হয়। অগ্রাধিকারমূলক এই নির্দেশনা অনুসরণ নিশ্চিত করে যে আরব ভাষা নীতির পরিভাষাগুলো কুরআনের অর্থ নির্ধারণ করতে অনুমোদন করা হয়নি। পরিশেষে বলা যায় ইসলামি আইনের শাসনমান ও উদ্দেশ্য সর্বজনীন। যারা সত্য অনুসন্ধান করছেন এবং স্বধর্মত্যাগ সংক্রান্ত বিশেষ আয়াতসমূহের অর্থ খুঁজছেন তাদের জন্য পথ আলোকিত করে।

এ ধরনের একটি বিতর্কিত প্রশ্নে স্বধর্মত্যাগের শাস্তির মতো একটি বিতর্কিত প্রশ্নকে মোকাবেলা করার জন্য মুসলিম আইনজ্ঞরা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা ইজতিহাদের অনুশীলনে নিয়োজিত। এ গবেষণায় গুরুত্বের সাথে ব্যক্তিগত স্বধর্মত্যাগের মৌলিক বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে : একজনের ব্যক্তিগত মতবাদ সংক্রান্ত বিশ্বাসসমূহ পরিবর্তন এবং এর ফলে তার চিন্তা, ধারণা ও আচরণের অদলবদল হয়েছে। তিনি স্বতন্ত্র মতবাদগত বিশ্বাসের পরিবর্তন করে সম্প্রদায় ও এর বিধিবিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি অথবা এর ধর্মীয় বা রাজনৈতিক বৈধ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে কোনো কাজে জড়িত হননি। কোনোভাবেই তিনি তার সম্প্রদায়ের জন্য হুমকি নন, তিনি শুধু তার মতবাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছেন। তিনি নতুন গ্রহণ করা মতবাদের পক্ষের একজন প্রকাশ্য প্রবক্তা হওয়ার বদলে, তার স্বধর্মত্যাগ নিজের কাছেই রেখেছেন।

এ গবেষণায় নিচের প্রশ্নগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে : যেমন– আল্লাহ প্রতিষ্ঠিত বিধান একজন ব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড শাস্তি দাবি করছে, তার সম্প্রদায় তাকে প্রথমে তওবা (অনুতপ্ত) করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে কিনা? অথচ তিনি বিশ্বাস পরিবর্তন করা ছাড়া অন্য কোনো অপরাধ করেননি এবং শাসকের প্রতিনিধি হিসেবে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার দায়িত্ব কি মুসলিম সমাজের? যেমন– আমরা উল্লেখ করেছি তিনি অন্য কোনো অপরাধের সাথে জড়িত নন এবং এটি যদি শুধু এই ব্যক্তির বিশ্বাস পরিবর্তনের মামলা হয়? যদি মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু লোক আইন নিজ হাতে তুলে নিয়ে এই ব্যক্তিকে হত্যা করে ফেলে, আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার জন্য তাদেরকে কি পাল্টা শাস্তি দিতে হবে, না কি এই শাস্তি থেকে অব্যাহতি দেয়া অথবা অন্য কিছু করা উচিত?

অনুরূপভাবে, এ ব্যক্তি এবং তার মতো অন্যদেরকে ইসলামে জোর করে ফিরে আসতে বাধ্য করা কি মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব? অথবা কুরআন কি এমন জবরদস্তি করার বৈধতাকে প্রত্যাখ্যান করেনি? তাছাড়া, ইসলামের শুরুতে কি এমন কোনো সর্বসম্মত চুক্তি হয়েছে স্বধর্ম ত্যাগ করলে তাকে

হত্যা করা মুসলিম সম্প্রদায়ের দায়িত্ব? অথবা এ বিষয়ে কি দৃশ্যমান মতানৈক্য আছে যার ওপর পর্যাপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে না? স্বধর্মত্যাগ করাকে কি শুধু নিছক ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হবে, না কি এটি ইসলামের বিরুদ্ধে একটি আগ্রাসনমূলক কাজ হিসেবে গণ্য করা হবে? যারা স্বধর্মত্যাগের কারণে মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন তাদের দৃষ্টিতে এটি কি রাজনৈতিক অপরাধ, অথবা অন্য কোনো গুরুতর অপরাধ? তাছাড়া, ধরে নেয়া যাক এটি একটি আইনত শাস্তি এবং ইসলামের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে। আইন কোন ধরনের ব্যক্তির পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে এ শাস্তি নির্ধারণ করছে, মৃত্যুদণ্ডকে কি স্বধর্মত্যাগের পাপমুক্তি এবং প্রায়শ্চিত্তের একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়?

এ গবেষণার লক্ষ্য, একটি মডেল উপস্থাপন করা– যার সাহায্যে ইসলামের ঐতিহ্যকে কুরআনের কর্তৃত্বের অধীনে সুবিন্যস্ত করে, সেই সূত্রে কুরআনের শিক্ষার সাথে সম্পূর্ণরূপে সঙ্গতিপূর্ণ করা যায়। ■

প্রথম অধ্যায়

ধর্মত্যাগ কি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ?

ধর্মত্যাগের কারণে আইনগত কী ব্যবস্থা নেয়া হবে, ইসলামের প্রথম তিন শতাব্দী পর্যন্ত এ ব্যাপারে মতপার্থক্য ছিল। তা সত্ত্বেও কেউ কেউ দাবি করেন, ইসলামি আইনে ধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডের ব্যাপারে ঐকমত্য ছিল। তাই তারা চান, তাদের দিকে মনোযোগ আকর্ষণের মাধ্যমে মানুষকে সত্য থেকে ফিরিয়ে নিজেদের মতের পক্ষের দল ভারি করতে। অথচ রাসূল সা.-এর সাহাবি উমর ইবন আল খাত্তাব, ইবরাহিম আল নাখি, সুফিয়ান আল সাওরি ও অন্যান্য ইসলামি স্কলাররা এই শাস্তি সমর্থন করেননি। তারা চেয়েছিলেন পরবর্তী চিন্তাবিদরা আগের বিষয়টি নিয়ে আবার একটু চিন্তা করুক।

স্বধর্মত্যাগ করলে তার সাথে কেমন আচরণ করা হবে বিষয়টি নির্ভর করবে ব্যক্তির মত প্রকাশের অধিকার, ব্যক্তিগত বিচার-বিবেচনা ও বিশ্বাস অথবা সম্প্রদায়ের অধিকার সংরক্ষণ এবং পবিত্রতার সর্বোচ্চ নিরাপত্তা বিধানে কোন বিষয়টি বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত তার ওপর। ২০০৬ সালে আফগান নাগরিক আবদ আল রাহমান আবদ আল মান্নান বিশ্বমিডিয়ার সংবাদ শিরোনাম হয়েছিলেন খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ, বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যদিয়ে স্ত্রী ও সন্তানদের হারিয়ে এবং কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে। পরে অবশ্য বিশ্বনেতৃবৃন্দের চাপে তিনি কারামুক্ত হয়ে ইতালিতে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। তার এই মামলার ফলে ইসলামে স্বধর্মত্যাগ বিষয়টি বিশ্ববাসীর নজরে আসে। সারা পৃথিবীতে এটি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।

সাধারণত বিভিন্ন জাতি তাদের জাতীয় মূল্যবোধ রক্ষার জন্য সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সংগ্রাম করে। যে বিশেষ জাতীয় মূল্যবোধের জন্য সে পরিচিত তা সংরক্ষণে তারা সবসময় সচেষ্ট। কিছুদিন আগেও প্রত্যেক জাতির পরিচিতির

জন্য ধর্ম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে বিবেচিত হতো। একটি জাতির টিকে থাকা, গঠন, পরিচিতি তাদের নির্দিষ্ট ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক পদ্ধতি একই সুতায় বাঁধা। ইসলামি স্কলারগণ ধর্মীয় অনেক বিষয়ের মধ্যে পাঁচটিকে মানুষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় বলে গণ্য করেন। এর ভিত্তি ইসলামি আইনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যেমন– এই বিধানের সবার ওপরে ছিল জিহাদ। কারণ, জাতীয় পর্যায়ে ধর্ম হিসেবে ইসলামের সুরক্ষা এর ওপর নির্ভরশীল।

স্বধর্মত্যাগ করার পর কিছু লোক ব্যক্তিগত ও সম্মিলিতভাবে তাদের ধর্মের ক্ষতি করতে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করছে এবং অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। এমন অবস্থায় ধর্মের সুরক্ষার প্রয়োজনে স্বধর্মত্যাগের জন্য নির্ধারিত শাস্তি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ইস্যুতে ইসলামি পণ্ডিতদের মধ্যে কোনো মতপার্থক্য নেই। তারা ধর্মীয় স্বাধীনতার এই মৌলিক বিধান সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করেন। পবিত্র কুরআনের ঘোষণা, 'ধর্মের ব্যাপারে কোনো বল প্রয়োগ করা যাবে না' এবং স্বধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সমর্থনের মধ্যে তারা কোনো বৈপরীত্য স্বীকার করেন না। ইসলামের ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময় এই দৃষ্টিকোণ ছিল প্রতিষ্ঠিত আইন। কিন্তু প্রাথমিক যুগের ইসলামের প্রখ্যাত আলেমদের দৃষ্টিভঙ্গি বিচার বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তারা এই মত সমর্থন করেননি। মর্যাদাবান এই স্কলারদের সংখ্যা এত বেশি যে তাদের উপেক্ষা করার উপায় নেই। যেমন– সাহাবি উমর ইবন আল খাত্তাব (মৃ. ৬৪৪ খ্রিষ্টাব্দ), ইবরাহিম আল নাখি (মৃ. ৮১১ খ্রিষ্টাব্দ), সুফিয়ান আল সাওরি (মৃ. ৭৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং অন্যান্য আরো বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব– যারা প্রচার বা ব্যাপক প্রচলন পাননি। প্রচারণার অভাবে যাদের কথা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি।

যাই হোক, ইসলামি আইনশাস্ত্র তার পথ পরিক্রমায় এ বিষয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে। দাবি করা হয় অধিকাংশ বিজ্ঞ ফকিহর 'সর্বসম্মত' রায় হলো, মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়ে একজন স্বধর্মত্যাগকারীকে ইসলামে ফিরে আসতে বাধ্য করা। এই রায়ের উদ্দেশ্য বুঝতে হবে। একটি জাতি হিসেবে যখন সবেমাত্র মুসলিমদের ভিত্তি রচিত হচ্ছে, সেই সময় এই ধর্মের কর্মকাণ্ডগুলোকে কেউ যেন তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞা করার সাহস না পায়। রাষ্ট্রের ভিত্তি, বৈধতা, ইসলামি মতবাদ, আইনের উৎস এবং মুসলিম রাষ্ট্রের পুরো জীবনযাপন পদ্ধতির সুরক্ষার জন্যই তারা এই রায় দিয়েছিলেন।

এই রায় ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও ধর্ম বাছাই করার মানবাধিকারের সাথে বিরোধপূর্ণ। কোনো বল প্রয়োগ ছাড়া যে কাউকে তার বিশ্বাসের পক্ষে মতামত

ব্যক্ত করতে দেওয়ার এই অধিকারের আলোচনা সত্যিকার অর্থে যে সকল সংস্কারকরা শুরু করেন, তাঁরা হলেন, জামাল আল দিন আল আফগানি, শায়খ মুহাম্মদ আবদুহু, রশিদ রেজা প্রমুখ। তাঁরা উদ্বিগ্ন, কারণ একজন স্বধর্মত্যাগকারীকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়ে হলেও ফিরিয়ে আনা ইসলামেরই শিক্ষা বলে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। অথচ ইসলামে বিশ্বাস ও মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে এর মধ্য দিয়ে তা উপেক্ষিত হচ্ছে। আল আফগানি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *আল রাদ্দ আলা আল দাবিরিয়িন* (Al-Radd ala al-Dabiriyyin)-এ দৃঢ়তার সাথে একজন মুসলিমের জন্য কুরআনের নির্দেশ মানার পক্ষে শান্তিপূর্ণ যুক্তি তুলে ধরে তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তারা যে দাবি করেছেন তিনি তার উত্তর দিয়েছেন। আল আফগানি তাদের পক্ষ থেকে তোলা সন্দেহ ও যুক্তি ইসলামের যথাযথ দলিলের মাধ্যমে খণ্ডন করেছেন। তারপরও এ বিষয়টির মীমাংসা সে সময় হয়নি, বিতর্কিতই রয়ে গেছে, সংশয় দূর না হওয়ায় সাধারণ জনগণ বিষয়টি গ্রহণ করেনি।

১৯৮৫ সালে সুদানের প্রেসিডেন্ট জাফর নুমাইরি ইসলামি আইন জারি করে খুব দ্রুত মাহমুদ মুহাম্মদ ত্বাহার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেন। এই ধারাবাহিকতা অনুসরণ করে পরবর্তীতে ইরানের ইমাম খোমেনি সালমান রুশদির বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডাদেশ জারি করেন। এ দুটি ঘটনা ব্যাপকভাবে বিশ্ববাসীর নজর কাড়ে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ইসলামকে সমসাময়িক পাশ্চাত্য দুনিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধ স্বাধীনতার পরিপন্থি বলে ঘোষণা করেছিল। স্বধর্মত্যাগের জন্য রুশদির বিরুদ্ধে দেওয়া মৃত্যুদণ্ডের চিরস্থায়ী রায়ের ওপর স্থিতাবস্থা আরোপ করা হয় প্রামাণ্য গ্রন্থের ফতওয়া অনুসরণ করে। এমন আরো অনেক ঘটনা মিশরে ঘটেছে। জাতিসংঘ, এর সহযোগী অঙ্গ সংগঠন এবং নতুন বিশ্বব্যবস্থার পক্ষের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো যখন অব্যাহতভাবে ঘোষণা দিয়ে ইসলামকে আক্রমণ করেছে তখন মিশরের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণির মধ্যে মতবিরোধের বীজ রোপণ করা হয়েছে। প্লেগ মহামারির মতো অব্যাহতভাবে চলতে থাকা এই কঠিন সমস্যার মোকাবেলা মুসলিমরা কীভাবে করবে? এর সমাধান না হলে সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশ ইসলাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পর হয়ে যাবে এবং আক্রান্ত হবে।

মুসলিম ফিকাহবিদগণ তাদের গবেষণায় একটি পদ্ধতি অনুসরণ করেন। এজন্য তারা যে পরিভাষা ব্যবহার করেন তাহলো *হাদ্দ* (বহুবচন *হুদুদ*)। এর অর্থ আল্লাহর আইন ও বিধান। আরবদের মধ্যে দুটি জিনিসের মাঝে

প্রতিবন্ধকতা বা বাধা বুঝাতে *হাদ্দ* শব্দটি ব্যবহারের প্রবণতা বেশি। এই পরিভাষাটি মুসলিম ফকিহ ও স্কলারদের মধ্যে আইনবিজ্ঞানে ব্যবহার করার অতিমাত্রায় ঝোঁক এই কারণে নয় যে এটি 'আরবি ভাষা', বরং এর কারণ এটি 'কুরআনের ভাষা'। একটি উদাহরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কুরআনের পনেরোটি আয়াতে *হাদ্দ* ও এর বহুবচন *হুদুদ* পরিভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে। দুটি জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে আল্লাহর আইন এবং নির্দেশ বুঝাতে। *সিয়াম* (রোজা), বিবাহ বিচ্ছেদ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইন ও নির্দেশ সংক্রান্ত আয়াতে। *হুদুদের* শাস্তি নির্দেশ করা হয়েছে এমন কোনো আয়াত নেই। কিন্তু এর পরিবর্তে আল্লাহর বিধি ও আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

কুরআন জোর দিয়েছে, পারিবারিক সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট আল্লাহর আইন সংক্রান্ত বিষয়গুলোর ওপর। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো একজন ফকিহ কীভাবে একটি কুরআনের পরিভাষাকে পরিবর্তন করে ব্যবহার করেন, এর অর্থকে সীমাবদ্ধ করেন অপরাধীর দণ্ডবিধির মধ্যে। *হাদ্দ* শব্দটি ভাষাতাত্ত্বিক দিয়ে বুঝায় প্রতিরোধ অথবা নিষেধ। এছাড়া, কুরআনে চুরি ও ব্যভিচারের শাস্তির কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হাদ্দ পরিভাষা ব্যবহার করা হয়নি। কুরআনের এ স্পষ্ট লঙ্ঘনের পিছনে কী রয়েছে?

একজন শাসকের গুরুত্ব ও মর্যাদা নির্ভর করে তার দণ্ডবিধির আকর্ষণীয় আদেশ, সম্মানজনক কর্তৃত্ব এবং অর্জিত লক্ষ্যের ওপর। সবচেয়ে দুর্দান্ত দণ্ডবিধি দেওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহতায়ালা। একজন শাসক তাঁর রাজ্যের জন্য সবচেয়ে বেশি এই দণ্ডবিধির ফলাফলের সুবিধা দিতে পারেন। এই দণ্ডনীতির অপব্যবহার করে স্বৈরাচারী ও খামখেয়ালিপূর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইমাম মালিক, ইমাম আবু হানিফা, ইমাম আল শাফি, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, হাসান আল বসরি, সুফিয়ান আল সাওরি ও অন্যান্য ধর্মনিষ্ঠ স্কলারগণ বার বার শাসকদের সমালোচনা করেছেন। পূর্বসূরী ফিকাহবিদদের মুসলিম ঐতিহ্য নিয়ে লিখিত সংকলন যা উত্তরাধিকার সূত্রে তাদের অনুসারীরা পেয়েছেন তাতে স্থান পেয়েছে পূর্বসূরী ফকিহরা শাসকদের সুপথে পরিচালিত করতে তাদের উদ্দেশ্যে যেসব হেদায়েত, ধর্মীয় উপদেশ, পরামর্শ, চিঠি দিয়েছেন এবং তাদের আইন ও বিধিবিধান সংক্রান্ত লেখা। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের যুগের 'রাজনৈতিক ইসলাম'-এর কতিপয় প্রবক্তা ইসলাম ও ইসলামি দণ্ডবিধি তাঁরা নিজেরা নিজেরাই তাঁদের

মতো করে বদলে নেন। তাই ইসলামি আইন প্রয়োগের কথা বলে তাঁরা আসলে 'ইসলামি আইন' বলতে কী বুঝাতে চান, তা নিজেরাই বুঝেন না। কিন্তু এর সাহায্য নিয়ে শাস্তি দিতে চান। একইভাবে কিছু শাসকেরা ধর্মের কঠোরতা এবং শরিয়াহর প্রতি তাদের অঙ্গীকার প্রদর্শনের জন্য দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করেন।

ধর্মীয় মানবিকতা ও ধর্মকে বুঝার নানা পন্থা অনুসরণ করার পরিণতিতে যে বিকৃতি ঘটে তা ধর্মের পবিত্রতার সাথে সাংঘর্ষিক। এ ধরনের বিকৃতি ধর্মের ধারণাকে নষ্ট করে। যা তাদের যুক্তিসংগত বৈধতার ধারণা এবং প্রদত্ত অন্যান্য তাৎপর্যকে সারশূন্য করে। আল্লাহ ঘোষণা করেছেন যে, তিনি নবী ও রাসূলদের পাঠিয়েছেন কারণ, তাঁর সাথে যুক্তি-তর্ক করার ক্ষমতা মানুষের নেই। কিন্তু মানুষের সহজাত বৈশিষ্ট্য হলো তারা দৃঢ়তার সাথে কোনো বিষয় মেনে নেয়ার জন্য যুক্তি তর্ক করে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ তালাশ করে। কুরআন ইসলামের চিন্তার শেষ সীমাগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছে। তারা তাদের জীবনকে এর আলোকে নতুন করে সাজিয়ে প্রতিটি যুগ অতিক্রম করবে। ইসলাম কোনো নির্দিষ্ট যুগের মতবাদ নয়, এর ভিত্তি ও আইন সুদৃঢ়। সুন্নাহ কুরআনের সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা এবং বুঝার সবচেয়ে নির্ভুল মাপকাঠি।

সুন্নাহ রাসূল সা.-এর অনুকরণীয় গোটা জীবনযাপন প্রণালী হিসেবে গৃহীত। তাই, আমাদের দুয়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য বুঝা উচিত, একদিকে তাঁর মতো হওয়ার সাধনা (অনুসরণ) ও আনুগত্য এবং অন্যদিকে অনুকরণ (নকল করা) ও সমালোচনাহীন স্বীকৃতি। অনুসরণ ও আনুগত্য এমন একটি পদ্ধতি যা প্রামাণ্য তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে একজনের জ্ঞান এবং উপলব্ধি স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে। নকল অনুকরণ ও সমালোচনাহীন স্বীকৃতি (আল-তাকলিদ) দানকারীরা একজন ভাঁড়ের মতো চিন্তা-ভাবনা না করেই অনুকরণ করে, তার মধ্যে কোনো তথ্য-প্রমাণ, পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতিফলন থাকে না।

ইজতিহাদ ইসলামি আইনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এটি ইসলামি আইনের মৌলিক, স্বাধীন যুক্তি ও সংস্কারের জন্য অপরিহার্য। সুন্নাহকে কুরআনের আলোকে পরিষ্কারভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং তার মতো বিবেচনা করে প্রয়োগ করার জন্য অনুসন্ধানই ইজতিহাদ। এই ব্যাখ্যার গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হলো, বৈচিত্র্যময় পৃথিবীর বিভিন্ন ধরনের নানান মতের মানুষের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো স্বীকার ও বিবেচনায় নেয়া। ■

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য

কুরআনে স্বধর্মত্যাগের ধারণার মৌলিক উপাদানগুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। এর সারসংক্ষেপ হলো, স্বধর্মত্যাগ এবং অনুতপ্ত না হওয়া অথবা ইসলাম ও আল্লাহকে স্বীকার না করার জন্য পরকালে শাস্তির বিষয় না মানা। স্বধর্মত্যাগকারী ব্যক্তি শুধু নিজেরই ক্ষতি করে। যে বার বার তার ধর্মকে ত্যাগ করে সে যত যাই করুক না কেন আল্লাহ্‌র ক্ষমা পাবে না।

স্বধর্মত্যাগে অবিচল কাউকে জোর-জব্বরদস্তি করে ভয় দেখিয়ে বাধ্য করা হলেও অন্য কিছু তার পছন্দ না হলে প্রকৃত বিশ্বাসে কোনো প্রভাব পড়বে না। শুধু অন্তর থেকে আত্মসচেতন হয়ে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে স্বধর্মত্যাগকারী তার বিশ্বাস প্রত্যাখ্যান করলেই প্রকৃত সত্যের প্রতিফলন ঘটবে। দুর্বল বিশ্বাস, সত্য সম্পর্কে নিশ্চিত হতে না পারা এবং বিশুদ্ধ মনে আল্লাহর এবাদতের ব্যর্থতা স্বধর্মত্যাগের সবচয়ে গুরুত্বপূর্ণ পথ। সত্যকে অস্বীকার করে কোনো কাজ করলে তা কোনোকিছু বয়ে আনে না এবং এ ফলাফল তার জন্য অবশ্যই প্রত্যাশিত।[১] 'স্বধর্মত্যাগ' পরিভাষাটি দিয়ে এমন ধারণাকে বুঝানো হয় যা ইসলাম ও বিশ্বাসের পথে চলতে চলতে উল্টো পথে বাঁক নেয়। অথচ এর আগে তারা আল্লাহর আদেশ হিসেবে তা গ্রহণ করে ওই পথে চলছিলেন।

আল-রিদ্দাহ এবং *আল-ইরতিদাদ* পরিভাষাগুলো দ্বারা কুরআনে কেউ কোনোকিছু ত্যাগ করে কোথাও গিয়ে পৌঁছলো, আবার তা সাথে নিয়ে আগের অবস্থানে ফিরে আসলো বুঝায়। তবে কুরআনের কোনো আয়াতে কেউ শুধু ইসলাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলো অথবা শুধু আধ্যাত্মিকভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করলো স্বধর্মত্যাগের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলা হয়নি। বরং কুরআন *রিদ্দা* পরিভাষাটি ক্রিয়াপদ হিসেবে ব্যবহার করেছে একসাথে আধ্যাত্মিক ও

বস্তুগত ফিরিয়ে নেয়া অথবা মুখ ফিরানো অর্থে। কুরআনে *রিদ্দাহ* অর্থ পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে, ইসলামকে অবিশ্বাস করে এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে যাওয়া। যদিও কুরআনে এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোতে সতর্ক করা হয়েছে। সাথে সাথে প্রত্যেককে অনুপ্রাণিত করে বলা হয়েছে, ইসলাম গ্রহণ করার পর তা অবিচলভাবে ধরে রাখতে, কারণ এটিই সত্যিকারের সবচেয়ে প্রমাণিত, নির্ভরযোগ্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জীবনবিধান।

কুরআন স্বধর্মত্যাগ অথবা *রিদ্দাহর* এই ব্যাখ্যা ও ধারণা দিয়েছে। কুরআনে আমরা দেখতে পাচ্ছি কীভাবে কুরআন এই ভাষাগত শব্দটিকে ধর্মের সাথে সম্পর্কিত একটি ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হিসেবে ব্যবহার করে বিভিন্ন অর্থ বুঝাতে ব্যবহার করেছে। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য *রিদ্দাহ* ব্যবহার করা হয়েছে ইসলাম থেকে সরে আসা অর্থে। কোনো ব্যক্তি তখনি তার বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন, যখন তিনি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করার পর সত্যকে অস্বীকার করেন। *রিদ্দাহ* শত শত বছর ধরে দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ধর্ম থেকে সরে আসা, বিশেষভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তা ত্যাগ করা অর্থে।

উল্লেখিত আয়াতে *রিদ্দাহ* অথবা *ইরতিদাদ* সম্পর্কে কুরআনের সকল ধারণা তুলে ধরা হয়েছে। এতে স্বধর্মত্যাগের পাপ অথবা অপরাধের পার্থিব কোনো শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়নি। স্বধর্মত্যাগীকে ইসলামে ফিরে আসার জন্য বলপ্রয়োগ এবং ফিরে না আসলে হত্যা করা– দুটির মধ্যে কোন শাস্তি দিতে হবে সুস্পষ্ট অথবা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। কুরআনে বর্ণিত পরিভাষা *রিদ্দাহ* মনস্তাত্ত্বিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থার প্রতিফলন যা স্বধর্মত্যাগের বিষয়ে আলাদাভাবে আনা হয়েছে।

ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ইসলামি আইনের সবচেয়ে মূল্যবান এবং অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। প্রকৃতপক্ষে, সবচেয়ে লক্ষণীয় ভূমিকা পালন করতে হবে বিশ্বাসের আলোকে, এক আল্লাহর সুস্পষ্ট স্বীকৃতি দিতে হবে। মানুষকে অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, মূর্তিপূজা ও নিজের তৈরি করা প্রভু থেকে মুক্ত হয়ে একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাথে সম্পর্ক করতে হবে। কুরআনে অনেক আয়াতে ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থন, প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে কুরআনের অনেক আয়াত ধর্মীয় স্বাধীনতার একনিষ্ঠ সমর্থন ব্যক্ত করেছে। অন্যত্র ধর্মীয় অধিকার বাইরের হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা থেকে রক্ষা ও সংরক্ষণ বাধ্যতামূলক বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

এ সংক্রান্ত আয়াতে সবার আগে যে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে একটি হলো, 'বিশ্বাসের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের সুযোগ নেই'।[২] চার হিজরিতে যখন মক্কার কাফিরদের সাথে যুদ্ধের সময় সাহাবিরা রাসূল সা.-এর কাছে অনুমতি চান তাদের সাথে আসা ইহুদি ধর্ম গ্রহণকারী কিছু শিশুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করার, যারা তাদেরকে ইহুদিদের সাথে বসবাসে বাধাও সৃষ্টি করে, কিন্তু রাসূল সা. তাঁদেরকে এ থেকে বিরত রাখেন। এই বিষয়টি যতটা না ধর্মের সাথে সম্পর্কিত তারচেয়ে বেশি রাজনৈতিক। কোনো কোনো ধর্মের কিছু অনুসারীর মধ্যে এটি একটি নিয়মে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে খ্রিষ্টানরা মানুষের বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য জোর-জবরদস্তি করে থাকে।[৩] কুরআনের অনেক আয়াতে রাসূল সা.-কে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে– বিশ্বাস জোর-জব্বরদস্তি ও অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়ার বিষয় নয়।[৪]

কুরআনে বর্ণিত অবিশ্বাসী ও স্বধর্মত্যাগকারী এই দুইয়ের মধ্যে একটি পার্থক্য টানা যেতে পারে। কুরআনের ঝোঁক যাদের দিকে তারা 'আদি অবিশ্বাসী' অর্থাৎ এমন অবিশ্বাসী যারা কখনো ঈমান আনেনি। আর এখানে বুঝানো হয়েছে এমন অবিশ্বাসীদেরকে যারা ঈমান আনার পর ইসলাম ত্যাগ করেছে। যেমন– কুরআনে বর্ণিত কিছু পার্থক্য মেনে নিয়ে একজন আদি অবিশ্বাসী ইসলামি রাষ্ট্রে যে স্বাধীনতা ভোগ করেন, ঈমান আনার পর ইসলাম ত্যাগ করা অবিশ্বাসী সেই স্বাধীনতা পাবেন না।

এর সাথে জড়িত স্বধধর্মত্যাগের কারণে অনুতাপের বা তওবার প্রশ্ন, যদিও তার তওবা কবুল করা হবে কি হবে না এর সমস্ত বিষয়টি আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল। যতদিন স্বধর্মত্যাগ করার পর স্বধর্মত্যাগী কোনো ফৌজদারি অপরাধ না করবেন ততদিন এটি আল্লাহ ও এ ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ একান্ত বিষয়, দুনিয়ার কোনো শাসকের এখানে কিছু করার নেই। ■

তৃতীয় অধ্যায়

রাসূল সা.-এর সময়ে স্বধর্মত্যাগ

ইসলামে এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে কুরআন ইসলামের দর্শন, আইন, পদ্ধতি, মূলনীতি, বিধানসমূহের মৌলিক উৎস। কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং রাসূল সা. কুরআনের শিক্ষা কীভাবে কাজে লাগিয়েছেন তার উদাহরণ হলো সুন্নাহ। কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে পার্থক্য অনেক। কুরআন হলো ইসলামি আইনগত বিধানের প্রথম ভিত্তি। বিশুদ্ধ সুন্নাহ হলো কুরআনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বাধ্যতামূলক নির্ধারিত উৎস। কুরআন ও সুন্নাহ মিলেই সমর্থনযোগ্য প্রামাণ্য দলিল। দুটির মধ্যে কোনো দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি, অসামঞ্জস্য অথবা মতানৈক্য নেই। সুন্নাহর এমন কোনো অংশ বাতিল করা যাবে না যা কুরআনে বলা হয়েছে। সুন্নাহ কুরআনকে যুক্তি ও ব্যাখ্যাসহ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

কুরআনের মূলনীতি এবং নিজস্ব পদ্ধতি সুস্পষ্টভাবে নিঃশর্ত স্বাভাবিক ধর্মীয় স্বাধীনতা নির্দেশ করে। কুরআনে সুস্পষ্টভাবে অবিশ্বাসী অথবা স্বধর্মত্যাগীর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছে, তাদেরকে পরকালে শাস্তি দেয়া হবে। নবী সা.-এর সময় তাঁর উপস্থিতিতে হাজার হাজার লোক ঈমান এনেছেন, পরবর্তীতে মুনাফিক হয়ে গেছেন অথবা স্বধর্মত্যাগ করেছেন। সত্যিকার অর্থেই তাদের স্বধর্মত্যাগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিলো যে, তাদের এ ঘোষণা নবী সা. ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষতির কারণ হয়েছে। তারপরও তিনি তাদের কোনো ক্ষতি করেননি। কেউ বলতে পারবে না, 'মুহাম্মদ তাঁর সাহাবিদের হত্যা করেছেন'। তিনি তাঁর মতবাদ কারো ওপর জোর করে চাপিয়ে দেয়া অথবা ধর্ম গ্রহণ করার জন্য বলপ্রয়োগ করা থেকে বিরত ছিলেন। যেসব অপরাধের শাস্তির জন্য সতর্ক করা আছে, এমন অপরাধ কেউ না করলে রাসূল সা. কাউকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছেন এমন কোনো ঘটনা নেই।

অধিকাংশ ইতিহাসবিদ এবং রাসূল সা.-এর জীবনী (সিরাতুন্নবি সা.) লেখক স্কলারগণ একটি ঘটনা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। একদিন রাসূল সা. বললেন, রাতে একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তিনি মক্কা হতে জেরুসালেম ভ্রমণ করেছেন। এ কথা শুনে নতুন ইসলাম গ্রহণ করা কিছু লোক আবার ফিরে গেলো আগের ধর্মে। রাসূল সা.-এর কথা বিশ্বাস করতে না পেরে তারা স্বধর্মত্যাগী হয়ে গেলেন। বিভিন্ন হাদিসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত আছে রাসূল সা.-এর জীবদ্দশায় ব্যক্তিগতভাবে যুদ্ধাপরাধ ও হত্যার মতো অপরাধের দায়ে স্বধর্মত্যাগীদের মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে কিন্তু শুধু স্বধর্মত্যাগের কারণে তাদেরকে এ শাস্তি দেওয়া হয়নি।[৫] আল্লাহ নবী সা.-কে অবশ্যই সত্য অস্বীকারকারী ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নির্দেশ দিয়েছেন। ইমান আনার পর আবার অবিশ্বাসের পথে ফিরে যাওয়া প্রত্যেককে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এমন কোনো বিধান আল্লাহ দেননি। আমরা কুরআনে কিংবা রাসূল সা.-এর কাজে এমন কোনো ইঙ্গিত খুঁজে পাই না যে স্বধর্মত্যাগের নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে আল্লাহ তাঁকে সচেতন করেছেন। যদি তিনি এজন্য কোনো শাস্তির ব্যাপারে তাঁকে জানাতেন, তাহলে তা বাস্তবায়নে তিনি কোনো দ্বিধা করতেন না যেমন তিনি অন্যান্য অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি বিধানে অবিচল।

যখন মুসলিম আইনজ্ঞরা দেখলেন, কুরআন স্বধর্মত্যাগের জন্য কোনো আইনি শাস্তি নির্ধারণ করেনি, অনুরূপভাবে রাসূল সা.-এর সুন্নাহতেও দেখা যায় এ সংক্রান্ত শাস্তির ব্যাপারে তিনি কোনো কথা বলেননি এবং করেও দেখাননি এবং কুরআনের প্রায় দু'শ আয়াতে কোনো ব্যক্তি কী বিশ্বাস করবে সে ব্যাপারে তার পছন্দের স্বাধীনতাকে ইসলামের সর্বোচ্চ মূল্যবোধ ঘোষণা করা হয়েছে তখন স্বধর্মত্যাগকারীকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে এ দাবির পক্ষে তারা ঐকমত্যে পৌঁছলেন নবী সা.-এর সাহাবিদের অসম্পন্ন হাদিসকে অবলম্বন করে একটি বিবৃতি যা নবী সা.-এর নামে বর্ণিত এবং অনেকগুলো আরোপিত বর্ণনা ও দৃষ্টান্ত থেকে যেগুলোর একটিও সন্দেহমুক্ত নয়।

রাসূল সা.-এর সিরাতের আর একটি উদাহরণ দেওয়া হলো : ৬২৭ খ্রিষ্টাব্দে মক্কায় মুসলিমদের সাথে কুরাইশ গোত্রের একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হয়েছিল। এই চুক্তিতে দু'পক্ষ দশ বছর যুদ্ধ না করার ওয়াদা করেছিল। হুদাইবিয়ার এই সন্ধি দশ বছর কার্যকর থাকার কথা ছিল। কিন্তু মাত্র দু'বছর পর কুরাইশরা চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে। স্বধর্মত্যাগের কারণে শাস্তি না দেওয়ার ক্ষেত্রে হুদাইবিয়ার সন্ধি রাসূল সা.-এর একটি ভালো নির্দেশনা। যেহেতু চুক্তির

একটি মূল শর্ত ছিল, চুক্তি বিদ্যমান অবস্থায় অবশ্যই আল্লাহর নির্দেশ কিংবা রাজনৈতিক কারণে অথবা অন্য যেকোনো কারণে কাউকে এই নীতি অমান্য করতে বাধ্য করা যাবে না। এই চুক্তি অনুসারে কেউ যদি মুসলিম শিবির ত্যাগ করে কুরাইশদের কাছে ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করে, কোনো প্রকার বদলা ছাড়াই তাকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এই চুক্তি ছিল আল্লাহর আদেশ অমান্য না করে শান্তি অন্বেষণের গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। এই সুযোগ উপেক্ষা করা যায় না। উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় এই চুক্তির পর স্বধর্মত্যাগ করার জন্য আইন তৈরি করে কারো শাস্তি দাবি করা হবে সুস্পষ্ট ভুল। কারণ, এমন কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ ও নির্দেশনা নেই যার ওপর ভিত্তি করে ধারণা করা যায় কখনো এমন আইন ছিল।

এটি প্রতিষ্ঠিত সত্য যে রাসূল সা. সারাজীবনে একজন স্বধর্মত্যাগীকেও মৃত্যুদণ্ড দেননি। যদি তিনি জানতেন আল্লাহতায়ালা স্বধর্মত্যাগের জন্য কাউকে হত্যা করতে তাঁকে আদেশ দিয়েছেন, তাহলে তিনি যেকোনো অবস্থায় সেই আদেশ পালনে দ্বিধা করতেন না। এ গবেষণায় স্বধর্মত্যাগকারীকে হত্যা করা সংক্রান্ত যেসব দৃষ্টান্ত এবং এর সমর্থনে যেসব উদ্ধৃতি পাওয়া যায় তার সবগুলোতেই তারা স্বধর্মত্যাগের সাথে অন্যান্য অপরাধে জড়িত। তাদের স্বধর্মত্যাগ নিজ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণার শামিল এবং তারা শত্রুপক্ষের সাহায্যকারী। ■

চতুর্থ অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগের প্রতিক্রিয়ায় মৌখিক সুন্নাহর বক্তব্য

স্বধর্মত্যাগকারীকে হত্যা করতে হবে রাসূল সা.-এর মৌখিক নির্দেশ সংক্রান্ত এমন আহাদ-হাদিস (যে সব হাদিসের বর্ণনাকারী মাত্র একজন থাকে তাকে আহাদ হাদিস বলা হয়) আছে। স্বধর্মত্যাগকারীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সবচেয়ে বেশি উদ্ধৃত হয় এমন একটি হাদিস হচ্ছে : 'যদি কেউ তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো'। এ হাদিসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের পরে বেশি প্রচারিত হয়। যাহোক, সে সময়ের আগে এটি ছিল শুধু একটি আহাদ হাদিস। এটিকে বিবেচনা করা হতো বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা রক্ষা হয়নি এমন একটি অসম্পূর্ণ হাদিস হিসেবে।

এ হাদিসটি সেই পরিস্থিতির সাথে সম্পর্কিত যখন ইহুদি নেতারা রাসূল সা., তাঁর প্রচারিত বাণী এবং মিশন সম্পর্কে মদিনার মুসলিমদের মাঝে মিথ্যা ছড়িয়ে, তাদেরকে বিভক্ত করে এবং পুরো সম্প্রদায়ের সার্বিক ক্ষতির সম্ভাব্য সকল উপায়ে ক্ষতি করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। সেখানে এমন একটি ঘটনাও ছিল না যে একজন মুসলিম ইসলামে বিশ্বাস আনলো, স্বধর্মত্যাগ করলো, তারপর আবার ইসলামে ফিরে আসার ঘোষণা দিলো। এই পরিস্থিতিতে রাসূল সা. কাউকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন এমন কোনো ঘটনা নেই। অথচ এই হাদিসটিকেই ইসলাম স্বধর্মত্যাগীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করে তার স্বপক্ষে উদাহরণ হিসেবে প্রচার করা হয়। আলি রা.-এর বর্ণনাকে ভিত্তি ধরে এ হাদিসের সন্দেহজনক ব্যাখ্যা বর্তমান গবেষণায় প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনা প্রসঙ্গে কুরআনে নিম্নলিখিত আয়াত নাজিল হয়েছিল:

যদি মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা নগরে [মদিনায়] মিথ্যা সংবাদ ও গুজব রটনা থেকে বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের ওপর আপনাকে প্রবল করব। [হে মুহাম্মদ] অতঃপর তারা আপনার প্রতিবেশী হয়ে অল্প সময়ই থাকবে। অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। পূর্বে যারা চলে গেছে তাদের ব্যাপারে এটিই ছিল আল্লাহর বিধান। আপনি আল্লাহর বিধানে কখনও কোনো পরিবর্তন পাবেন না। (সুরা আল আহযাব : আয়াত ৬০-৬২)

কুরআনের এসব আয়াত নাজিল হয়েছে সম্মুখযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এভাবে ভিতর থেকে বিভক্ত করার ষড়যন্ত্র বন্ধ করতে। তাই হাদিস অনুযায়ী যদি আল্লাহর সংবাদবাহক বলেন, 'যদি কেউ তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো'– এই বাক্য তার মনের মধ্যে নিরাপত্তার সংকটজনক পরিস্থিতির প্রশ্ন সৃষ্টি করবে।

আমাদের ইসলামি আইনশাস্ত্রের একটি ক্ষতিকর এবং প্রায়শ ব্যবহৃত রীতি হলো অনুশীলনের ক্ষেত্রে হাদিসের স্থান দেয়া হয় সবার ওপরে, যদিও তার ওপরে কুরআনের বাণী যেখানে এ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট বক্তব্য আছে। এর ফলে কুরআনের সর্বোচ্চ ও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় হাদিস (অধস্তন যা ব্যাখ্যা করছে) কুরআনের সমান বা সমান্তরাল মর্যাদার হচ্ছে। এই পদ্ধতির কারণে আশ্চর্যজনক নয় যে, হাদিসের রাজত্ব কুরআনের চেয়েও বিস্তৃত এবং এর ভিত্তিতেই রায় দেয়া হয়। এ কারণে এই গবেষণায় উদ্ধৃত হাদিস গ্রহণ করা হয়েছে বিভিন্ন বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা ও সব সংস্করণ, পাশাপাশি এর সমর্থনে প্রামাণ্য পাঠ্যগ্রন্থ এবং এ সম্পর্কে কোন স্কলার কী বলেছেন তা হতে।

এভাবে যে কেউ দেখতে পারবে স্কলাররা কীভাবে তা ব্যবহার করেছেন, যা খোদ কুরআনেই খুঁজে পাওয়া যায় না এমন বিষয়ের নিছক কল্পনানির্ভর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং তার ওপর ভিত্তি করে রায় দেয়া হয়েছে। কেউ এমন একটি উদাহরণ খুঁজে বের করুক যেখানে কুরআন মানুষের জীবন রক্ষায় অত্যন্ত যত্নবান সেখানে হাদিস জীবন ধ্বংসের অনুমোদন দিয়েছে; বরং এমন ধ্বংস প্রতিরোধের সম্ভাব্য সব উপায় অনুসন্ধান করা হয়েছে হাদিসে।

এছাড়াও, কুরআনে প্রায় দু'শ আয়াতে বিশ্বাসের ব্যাপারে বলপ্রয়োগের নীতিকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এবং কোনো ব্যক্তি কী বিশ্বাস করবে, কোন

ধর্মে বিশ্বাসের প্রকাশ্য ঘোষণা দেবে তা মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা। দেখা যায়, ধর্ম পরিবর্তনের জন্য দুনিয়াবি কোনো শাস্তি কুরআনে ঘোষণা করা হয়নি (যতদিন আলাদাভাবে অন্য কোনো পাপে কোনো ব্যক্তি অপরাধী না হবে)। পক্ষান্তরে, কুরআন বলেছে যে, স্বধর্মত্যাগের (অন্য কোনো অপরাধ যদি এর সাথে যুক্ত না হয়) শাস্তি ঘোষণা দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহর। যখন কেউ কুরআনের আলোকে এ হাদিসের অর্থ ও সংজ্ঞা স্বচ্ছভাবে উপস্থাপন করেন তখন আর কোনো জটিলতা থাকে না। তবে, যখন হাদিসের বিভিন্ন সংস্করণ কুরআন থেকে আলাদাভাবে পাঠ করা হয় এবং যখন কিছু বর্ণনাকারী এর সাথে অন্যান্য ঘটনা ও কাহিনি যোগ করেন, তখন হাদিসটি আর বোধগম্য থাকে না। অন্যদিকে বর্ণনাকারীর ধারাবাহিকতা অসম্পন্ন থাকলে এবং কিছু হাদিসে দুর্বলতা থাকলে তখন আর তার সূত্র ও সনদ নির্ভরযোগ্য থাকে না।[৬]

হাদিস বর্ণনার ধারাবহিকতার সমস্যা না থাকলেও মনে রাখা উচিত এর অনেকগুলোর সাথে মাত্র একজন মূল বর্ণনাকারীরই বা রাবির সম্পর্ক। কিছু বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বধর্মত্যাগী বা অবিশ্বাসীদের আগুনে পোড়াও; কিন্তু তাদেরকে তলোয়ার দিয়ে হত্যা করার পর আগুনে পোড়াতে হবে অথবা জীবন্ত অবস্থায় আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করতে হবে সে ব্যাপারে কিছু উল্লেখ করা হয়নি। অন্যদিকে, আমরা এ সংক্ষিপ্ত বিবরণে অনেকগুলো সন্দেহ ও অসঙ্গতি চিহ্নিত করেছি। এ গবেষণায় দেখানো হয়েছে অনুসরণের জন্য গুরুত্বের দিক থেকে কুরআনের অবস্থান সবার ওপরে; সুন্নাহর চেয়ে এর প্রভাব ও সার্বভৌমত্ব অনেক বেশি বিস্তৃত। আরো বলা যায়, কুরআন হলো হাদিসের বিশুদ্ধতার সত্যায়নকারী এবং এর বিপরীত চিন্তা করার সুযোগ নেই। এ বিষয়টি শক্তিশালী হয় ইসলামের প্রাথমিক যুগে খলিফা হজরত আবু বকর রা. ও উমর ইবন আল খাত্তাব রা.-এর দ্বারা যাঁরা মনোভাব ও নীতি উভয় দিক থেকে সঠিক পথে পরিচালিত ছিলেন। তাঁরা কুরআন এবং সুন্নাহর নির্দেশনা যথাযথ অনুসরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। ■

পঞ্চম অধ্যায়

ফিকাহবিদদের দৃষ্টিতে স্বধর্মত্যাগীদের শাস্তি

এ আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে দেখা হবে যে এ বিষয়ে ইসলামি আইনবিজ্ঞান ও আইনবিদদের (ফিকাহবিদ) অবস্থান কী এবং তারা কোন সাক্ষ্য বা দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে এ অবস্থান নিয়েছেন। ফিকাহবিদদের ভিত্তি ও অবস্থান দুটি মূল বুনিয়াদের ওপর প্রতিষ্ঠিত : মৌখিক সুন্নাহ ও সে হাদিসটিকে ভুল দৃষ্টিতে দেখা– 'যদি কেউ তার ধর্ম পরিবর্তন করে, তাকে হত্যা করো' এ উচ্চারণ। অধিকন্তু, এ হাদিসটি প্রত্যেক ইসলাম ত্যাগকারীর জন্য সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়, সে ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুক বা না করুক।

দ্বিতীয় ভিত্তি, ভুলে ভরা ঐকমত্যের দাবি; এমনকি স্কলারগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি বিষয়ে 'একমত'– ইসলামি আইনবিজ্ঞানের ফিকাহবিদদের মধ্যে এ বিষয়ে বিস্তর মতপার্থক্য আছে। সবচেয়ে স্বীকৃত ফিকাহবিদ গোষ্ঠী স্বধর্মত্যাগকে রাজনৈতিক চেতনার সাথে বিশ্বাস পরিবর্তনকে যুক্ত করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। কিছু গোষ্ঠী কর্তৃক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে– ইসলামে ধর্মত্যাগ একটি অপরাধ, এ অপরাধের শাস্তি আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন এবং কোনো দয়া-মায়া ছাড়া তা প্রয়োগ করতে হবে। অন্যরা বিশ্বাস করেন, স্বধর্মত্যাগ একটি সাধারণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ, এর শাস্তি দিতে হবে বিচার-বিবেচনা করে। তৃতীয় গোষ্ঠী এ মত পোষণ করেন, স্বধর্মত্যাগের শাস্তি 'ইসলামি আইন-বিধি' মেনে মুসলিম শাসকরা নির্ধারণ ও প্রয়োগ করবেন। এক্ষেত্রে তারা তাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা, আদেশ ও আইনের সংরক্ষণ এবং জনশৃঙ্খলা ও ঐক্যের দিকে খেয়াল রেখে স্বাধীনভাবে ইসলামি আইন অনুসরণ করবেন।

পূর্বে উল্লেখিত প্রভাবশালী হেজাজি পরিবেশে 'রাজনৈতিক' বিশ্বাসঘাতকতা এবং 'ধর্মীয়' স্বধর্মত্যাগ নিয়ে একটি মৌখিকভাবে প্রচলিত সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। মৌখিক এ প্রচলিত নিয়মে দেখা যায় কেউ ইহুদি সংস্কৃতিতে প্রভাবিত হয়ে পড়লে তাকে এবং কেউ ইহুদি ধর্মত্যাগ করলে তাকেও হত্যা করা প্রয়োজন। এছাড়াও, মুসলিমরা অনেক দেশ জয় করছিল– তাদের সবার নিজস্ব পদ্ধতি, প্রথা, সংস্কৃতি ও আইনের মধ্যে মুসলিম আইনগত অধিকারের সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল। এসব আইন ছিল আনুগত্য পরিবর্তন, রাজনৈতিক ও আইনি আদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। বাইজেন্টাইন, পারসিক এবং অন্যান্য সুপ্রতিষ্ঠিত আইন ও বিধিবদ্ধ আইন, সাধারণ প্রথা, সংস্কৃতি মুসলিমরা ওইসব দেশ জয় করার পর তা দিকবদল করে মুসলিম পরিবেশের সাথে একাকার হয়ে যায়। এসব আইন, বিধিবদ্ধ আইন, প্রথা এবং সংস্কৃতি মুসলিম বিধিকে বৈচিত্র্যমণ্ডিত করে।

আবু বকর রা.-এর খেলাফতের সময় (৬৩২-৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দ) 'স্বধর্মত্যাগের যুদ্ধের' নেপথ্যের কারণ সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। যদিও এর ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক কিন্তু আবু বকর রা. তাঁর বক্তব্যে একে ধর্মীয় মাত্রার সাথে সম্পর্কিত করেছেন: 'আমি অবশ্যই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো যে আনুষ্ঠানিক প্রার্থনাকে (নামাজ) কে জাকাত থেকে পৃথক করবে'। তাছাড়া, আবু বকর রা. 'ধর্ম' চেতনার একটি ধারণা দিয়েছেন যে ব্যাপক চেতনার মধ্যেই একত্রিত আছে আইন প্রণয়ন, ক্ষমতা, জনশৃঙ্খলা, সরকার পরিচালনার সব দিক এবং সকল বিষয়ই শরিয়াহর অধীন। এর সাথে মতবাদ ও আইনের কোনো স্পষ্ট বিভাজন নেই। স্বধর্মত্যাগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উদ্দেশ্য ছিল সেসব নাগরিকদের বাধ্য করা যারা মুসলিম উম্মাহর সদস্য ও রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে তাদের দায়িত্ব পালন ত্যাগ করেছে– যে দায়িত্ব ধর্মীয় বৈধ শক্তি থেকে উদ্ভূত এবং দেশপ্রেমের কর্তব্য হিসেবে ধর্ম কর্তৃক আরোপিত।

ইসলামি আইনশাস্ত্রের চারটি সুন্নি গোষ্ঠীর মধ্যে হানাফি মজহাব স্বধর্মত্যাগের অপরাধকে আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তির মধ্যে শ্রেণিভুক্ত করেনি। বরং সিয়ার শিরোনামে জিহাদ ও এ সংক্রান্ত লেখাগুলোতে বিষয়টি আলোচনা করা হয়েছে। ব্যতিক্রম ছাড়া হানাফি ফকিহদের ফতওয়া হচ্ছে যে, মহিলা ধর্মত্যাগকারীকে হত্যা করা যাবে না। কোনো বালক ধর্মত্যাগী হলে তাকে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগ পর্যন্ত হত্যা করা যাবে না, তবে কারাবন্দি করে রাখতে হবে। যদিও তাঁরা তাদের এ অবস্থানের পক্ষে পূর্বে বর্ণিত হাদিস 'যদি কেউ

ধর্মত্যাগ করে, তাকে হত্যা করো'– উদ্ধৃত করা ছাড়া কুরআন থেকে কোনো দলিল-প্রমাণ দেননি। তাঁরা রাসূল সা.-এর সাহাবিদের ঐকমত্যের ভিত্তিতে হাদিসটি সমর্থন করেছেন যেখানে উল্লেখিত হাদিসের ভিত্তি হচ্ছে খলিফা হজরত আবু বকর রা.-এর সময় নবী সা.-এর সাহাবিগণ সামাজিক বিশৃঙ্খলা রোধে স্বধর্মত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জরুরি মনে করেছিলেন। হানাফি ফিকাহবিদগণ স্বধর্মত্যাগকে রাজনৈতিক দিক থেকে দেখতে প্রয়াসী হয়েছেন।

মালেকি মজহাবে স্বধর্মত্যাগ এবং আল জেনা অথবা অবৈধ যৌনাচারকে একই শ্রেণিতে ফেলা হয়েছে। কিন্তু স্বধর্মত্যাগের অপরাধকে এ মজহাবে আল্লাহ নির্ধারিত বিধিবদ্ধ শাস্তির মধ্যে রাখা হয়নি। ইমাম মালেকের এ নির্দেশ ইসলামি রীতি ও সন্দেহযুক্ত হাদিস বনাম আল্লাহর বিধিবদ্ধ আইনের আলোকে। তিনি বলেন, কোনো স্বধর্মত্যাগকারী অনুতপ্ত না হলে তাকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে। এ বিষয়ে ইমাম মালেকের অবস্থান স্বধর্মত্যাগকারীকে অবশ্যই হত্যা করতে হবে, তিনি পুরুষ বা নারী তা বিবেচ্য নয়।

শাফেয়ি মজহাবে কুরআনের পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে শিরককে নিরুৎসাহিত করা সংক্রান্ত আয়াতের ভিত্তিতে। এতে বলা হয়েছে, তিনটি আইনসঙ্গত কারণের একটি ছাড়া কোনো মুসলিমকে হত্যা করা গ্রহণযোগ্য নয় : যদি কেউ বিশ্বাস আনার পর ত্যাগ করে, ব্যাভিচার করে এবং খুন করে– এই তিনটি অপরাধের যেকোনো একটি কেউ করলে তাকে হত্যা করা যাবে। ইমাম শাফেয়ি স্বধর্মত্যাগকারীর বিষয়টি গ্রহণ করেছেন কুরআনের নিম্নোক্ত চারটি আয়াতের আলোকে :

১. আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। (সুরা আনফাল : আয়াত ৩৯)

২. ... তাদের [মুশরিকদের] যেখানেই পাবে হত্যা করবে, তাদের বন্দি করবে, অবরোধ করবে এবং প্রত্যেক ঘাটিতে তাদের জন্য ওঁৎ পেতে থাকবে। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে ও জাকাত দেয়– তবে তাদের পথ ছেড়ে দিবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সুরা তাওবা : আয়াত ৫)

৩. তোমাদের মধ্যে যে-কেউ নিজ দ্বীন হতে ফিরে যায় এবং কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, দুনিয়া ও আখেরাতে তাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়। এরাই দোজখবাসী, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। (সুরা বাকারা : আয়াত ২১৭)

৪. তোমাদের ও তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই ওহি হয়েছে, 'তুমি আল্লাহর শরিক স্থির করলে তোমার কর্ম তো নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্ত'। (সুরা জুমার : আয়াত ৬৫)

ইমাম শাফেয়ির উদ্ধৃত করা প্রথম আয়াতটিতে ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা রক্ষায় সশস্ত্র যুদ্ধকে অনুমোদন এবং লোকদের জোর করে তাদের ধর্ম পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা বন্ধ করা হয়েছে। শাফেয়ি মজহাবের মতে স্বধর্মত্যাগের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডযোগ্য, কারণ তারা কাফেরদের (আদি অবিশ্বাসী) চেয়েও অনেক বেশি গুরুতর অপরাধী এবং অনেক বেশি জঘন্য। তাদের ব্যাপারে এই অভিমতের ভিত্তি হলো, একজন স্বধর্মত্যাগকারীর পৃথিবীর সকল কাজ নিষ্ফল এবং আল্লাহর ক্ষমার দরজা তার জন্য বন্ধ। তবে উপরে উল্লেখিত কুরআনের চারটি আয়াতের উদ্ধৃতিতে তিনি আল্লাহর বিধিবদ্ধ আইনে স্বধর্মত্যাগের শাস্তির নির্দেশনা দিতে পারেননি।

হাম্বলি মজহাবের বিধান হচ্ছে– একজন স্বধর্মত্যাগকারীকে তার ধর্মত্যাগের জন্য হত্যা করা উচিত। তাঁদের এ মতের ভিত্তি আল্লাহর বিধিবদ্ধ আইন নয়, হাদিস– 'যদি কেউ তার ধর্ম পরিবর্তন করে তাকে হত্যা করো'।

এ অভিমতগুলোর কোনো কোনোটিতে রাজনৈতিক চেতনায় স্বধর্মত্যাগ এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্মমতের চেতনা থেকে স্বধর্মত্যাগ এ দুয়ের মধ্যে একটি স্পষ্ট বিভ্রান্তির প্রকাশ ঘটেছে। তাছাড়া, এ ব্যাপারে মজহাবগুলোর বিভিন্ন বিবরণের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে। স্বধর্মত্যাগের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদণ্ড দাবির সমর্থনে তাদের স্পষ্ট প্রমাণ অস্তিত্বহীন ও বিশদভাবে বর্ণিত পাঠ, যাতে ইসলামি আইনবিজ্ঞানের (ফিকাহশাস্ত্র) নীতিগুলো সংরক্ষিত। এ অবস্থানের পক্ষে অনেক ফিকাহবিদের সমর্থনের ইঙ্গিত রাষ্ট্র ও সমাজের নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত। বিষয়টির সাথে অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার বিভিন্ন সংযোগ আছে। বিষয়টিকে আমাদের অস্তিত্বের সাথে সম্পর্কিত দেখিয়ে ধারণা দেয়া হয়েছে, স্বধর্ম ত্যাগ এবং মুসলিম সমাজ/রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দু'ক্ষেত্রেই একটি আইন এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ইমামি শিয়া মজহাব অনুযায়ী দু-ধরনের স্বধর্মত্যাগকারী আছেন : একজন মুসলিম হিসেবে জন্মগ্রহণ করা স্বধর্মত্যাগকারী এবং অন্য ধর্ম হতে ইসলাম গ্রহণ করার পর আবার আগের ধর্মে ফিরে যাওয়া স্বধর্মত্যাগকারী। প্রথম প্রকারের স্বধর্মত্যাগকারীকে তওবার সুযোগ না দিয়ে দ্রুত হত্যা করতে হবে। যদি তিনি তওবা করে ফিরে আসতেও চান, তার তওবা গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তার আর ইসলামে প্রবেশের অনুমতি নেই। দ্বিতীয় প্রকার স্বধর্মত্যাগকারী একবার তওবা করার সুযোগ পাবেন, যদি তিনি তওবা করেন তার তওবা গ্রহণযোগ্য। কিন্তু যদি তওবা না করেন তাকে হত্যা করতে হবে। তিনি মহিলা হলে তাকে হত্যা করা যাবে না, তবে কারারুদ্ধ রাখতে হবে। এ মজহাবের অনুসারীরা স্বধর্মত্যাগকে আল্লাহ নির্ধারিত শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে দেখেন না। এর পরিবর্তে তারা এ অপরাধটিকে এমন শ্রেণিভুক্ত করেছেন যার শাস্তি হবে বিচার-বিবেচনাপ্রসূত।

জাহিরি মজহাব বলে, স্বধর্মত্যাগ এমন একটি অপরাধ যার শাস্তি আল্লাহ নির্ধারিত। তাদের দাবির পক্ষে যুক্তি, 'বিশ্বাসের ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাবে না'– কুরআনের এ আয়াত বাতিল (মানসুক) হয়ে গেছে। কারণ আল্লাহর নবী সা. আজীবন আরবের পৌত্তলিকদেরকে জোর দিয়ে বলেছেন, হয় ইসলাম গ্রহণ করো নয়তো এই তলোয়ার দিয়ে তোমাদের হত্যা করা হবে। অতএব এ আয়াত কিছু মানুষের জন্য প্রযোজ্য– যারা খ্রিষ্টান ও ইহুদি।

জায়েদি (শিয়া) মজহাবের বিশ্বাস স্বধর্মত্যাগকারীর মৃত্যুদণ্ড সম্পন্ন করার আগে তওবার সুযোগ দেয়া উচিত। এ মজহাবের অভিমত, স্বধর্মত্যাগ স্বধর্মত্যাগকারীর পক্ষ থেকে মুসলিম জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। যদিও তা প্রকৃত সত্য নয়, তবু এগুলো অন্তরে লুকানো সম্ভাব্য শক্তি।

অন্যসব মজহাবের চেয়ে সামান্য পৃথক ইবাদি (শিয়া) মজহাব স্বধর্মত্যাগীরা তওবা না করলে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে।

এ বিষয়ে কাজের পদ্ধতির ভিত্তিতে স্কলারদের মাঝে নানা বিভ্রান্তি দেখা যায়। অনেকগুলো কারণ থেকে এ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে। 'ধর্মের' বিস্তৃত ধারণা যা ঘিরে রেখেছে আইনগত পদ্ধতি এবং যা প্রয়োগ করার প্রয়োজন কোনো বাছবিচার ছাড়া তাদের বিভিন্ন বিশ্বাসের নাগরিকদের ওপর এবং কেউ বিভ্রান্ত হয়ে বিশ্বাস পরিবর্তনের সাথে নিজের ধর্মের সমর্থন ও আচরণ পরিবর্তন অথবা শত্রুর সাথে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে বিশ্বাস পরিবর্তন এবং

মুসলিম উম্মাহ ও সম্প্রদায়ের সাথে বিদ্রোহ করে এমন স্বধর্মত্যাগকারী একজন শত্রুযোদ্ধায় পরিণত হয়।

জনসমাজের মধ্যে আছে বিস্তর পার্থক্য। একজন অন্যজনের চেয়ে স্বতন্ত্র। একজনের সাথে অন্যজনের বিশ্বাস আলাদা। কুরআন এ পার্থক্যকে স্বীকার করে। তাই কুরআনের ঘোষণাগুলো হলো এমন যে, যার বিশ্বাস করার ইচ্ছে বিশ্বাস করতে পারে, যখন যার অবিশ্বাস করার ইচ্ছে, অবিশ্বাস করতে পারে। এমনকি নবী সা. মুসলিমদের জবরদস্তি করে বিশ্বাস করানোর চিন্তা করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ তাঁকে বলেছেন :

> আপনার প্রতিপালক ইচ্ছে করলে যারা পৃথিবীতে আছে তারা সকলেই অবশ্যই ঈমান আনতো, তবে কি আপনি মুমিন হওয়ার জন্য মানুষের ওপর জবরদস্তি করবেন? (সুরা ইউনুস : আয়াত ৯৯)

কুরআন বিশ্বাসের স্বাধীনতার নিরাপত্তা প্রদান ও সংরক্ষণ করেছে। তাছাড়া, এ ব্যাপারে কুরআনের যে অবস্থান– সুন্নাহরও তাই। বিশ্বাস পরিবর্তনের জন্য কাউকে শাস্তি দিলে সে শাস্তি কারো জীবনে যে প্রভাব আনবে কুরআন তা স্পষ্ট করেছে। অনুরূপভাবে সুন্নাহ স্পষ্ট করেছে যে, যদিও একক বিশ্বাস পরিবর্তন দ্বারা অন্য কিছু ব্যাখ্যা করা যেতে পারে, যেমন– পরোক্ষভাবে উম্মাহর বিরুদ্ধে শত্রুতা বা নাগরিক নিরাপত্তার জন্য হুমকি, তবুও এর জন্য দুনিয়ার জীবনে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়নি।

বরঞ্চ এর জন্য শাস্তি শুধু পরকালের জীবনে প্রযোজ্য। এটি এমন একটি বিশেষ মামলা যার ফয়সালা করার অধিকার এককভাবে সৃষ্টিকর্তার কাছে সংরক্ষিত এবং তাঁর সাথে দেনা-পাওনার বিষয়টি তিনিই বুঝে নিবেন, তিনিই নির্ধারণ করবেন অনন্তকালের জন্য তার আবাস কোথায় হবে। আল্লাহই সবকিছু ভালো জানেন। ■

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বধর্মত্যাগে অভিযুক্ত মুসলিম স্কলারগণ

আমাদের ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত কিছু শাসক তাদের বিরোধীদেরকে নিজের পক্ষে আনার জন্য 'শাস্তিকে' কোনো কারণ ছাড়াই অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বিরোধীদের মধ্যে বিশিষ্ট স্কলাররাও ছিলেন যারা শাসকদেরকে চরম স্বৈরাচারী ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উপদেশ দিতেন, আদেশ করতেন এবং তাদের বাধা দিতেন। এর প্রতিক্রিয়ায় পরাক্রমশালী শাসকরা আরো বেশি অত্যাচারী হয়ে ওঠেন। মুসলিমরা রাসূল সা.-এর ইন্তিকালের পর তাঁর নির্ধারিত পদ্ধতি মোতাবেক পারস্পরিক আলোচনার পন্থা ও কৌশল আবিষ্কার করতে পারেনি যা আল্লাহতায়ালার কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল। আল্লাহভীরু কিছু মুসলিম স্কলার উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যাতে সংযতভাবে পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে বিষয়টি সম্পাদিত হতে পারতো। কিন্তু অধিকাংশ শাসক এসব কণ্ঠকে স্তব্ধ করার চেষ্টা করেছেন যদিও এসব স্কলারের উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজেদেরকে, মুসলিম জাতিকে এবং শাসকদেরকে তাদের কর্তৃত্ববাদের অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করা।

ইসলামের ইতিহাস জুড়ে স্কলাররা চেয়েছিলেন ওই কর্তৃত্বের মধ্যে পিছনে থেকে রক্ষাকারীর ভূমিকা পালন করার মতো একটি শক্তি হিসেবে সমান পর্যায়ে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে। তাই তারা কুরআনে উল্লেখিত *'উলিল আল আমর'* বা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ পরিভাষাটির ব্যাখ্যা করেছেন দু-অর্থে– শাসক ও স্কলার। শেষযুগের ন্যায়পরায়ণ খলিফাদের রাজনৈতিক দৃষ্টির সাথে কর্তৃত্বের সমন্বয় করে অমীমাংসিত বিষয়গুলো কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিচার-বিবেচনা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার এবং ভালোমন্দের প্রভেদ করার

ক্ষমতা ছিল। তারা পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য ভালো হবে এমন ফরমান জারি এবং অন্যান্য সব কাজ সম্পন্ন করতেন। স্কলারগণ আগ্রহী হয়েছিলেন, তারা জাতীয় বিষয়গুলো এককভাবে ব্যবস্থাপনার অনুমতি দেননি। কিন্তু এক ধরনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী অভিজাত শাসক আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন স্কলারদের জনগণের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোতে প্রবেশ করতে বাধা দেয় যা তাদের তৎপরতা একটি নির্দিষ্ট সীমায় সীমাবদ্ধ রাখে।

ইতিহাসের এ অধ্যায়ে কুরআন ও নবী স.-এর বাস্তব জীবনের উদাহরণের মধ্যে অনৈক্য, অসংলগ্নতা ও উপেক্ষা করায় এবং কুরআন ও সুন্নাহর একটির সাথে অন্যটির গভীর বন্ধন সত্ত্বেও ছিন্ন করার চেষ্টা করার ফলে মুসলিম সম্প্রদায় অসংখ্য মতবিরোধের সাক্ষী হয়েছে। এর সাথে আরো যোগ হয়েছে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনবিজ্ঞান (ফিকাহশাস্ত্র) থেকে আলাদা করার প্রবণতা; ইসলামি মতবাদকে ইসলামি আইন থেকে; প্রাথমিক যুগের ফিকাহবিদদের ফিকাহ থেকে পরবর্তী যুগের ফিকাহবিদদের ফিকাহ। এমনিভাবে এ প্রবণতাও দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠাতা ইমামদের (ইমাম আবু হানিফা, আহমদ ইবন হাম্বল, আল শাফেয়ি ও ইমাম মালেক) লেখাগুলোকে আল্লাহর প্রণীত আইনের সমান ভাবা।

যেদিন মুসলিমরা কুরআন পরিত্যাগ করেছে এবং বিভ্রান্তি ও ভুলের কাছে পরাজিত হয়েছে, সেদিন থেকেই তাদের ঐক্য বিনষ্ট হয়েছে। তৃতীয় খলিফার সময় বিদ্রোহ ও তাঁর শাহাদাতের মধ্য দিয়ে এর সূচনা হয়েছে। সেসময় অব্যাহতভাবে চলতে থাকা রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের ফলে সংঘটিত হয় উটের যুদ্ধ ও সিফ্ফিনের ঘটনা। এর ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন মজহাবের উত্থান ঘটে এবং উত্তরাধিকারী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে কার নিয়ম আছে, কার ছিল– এমন বড়ত্ব প্রকাশের বাসনায় তাড়িত হয়ে তারা বিদ্রোহ ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। সুন্নি ও শিয়া, শাফেয়ি ও সালাফি, সালাফি ও বাদবাকি অন্য মুসলিমের মধ্যে প্লেগের মতো অসংখ্য দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং সনাতন ও আধুনিকপন্থি, উল্লেখ না করা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও উপদলের সংগ্রাম আধুনিক সময় পর্যন্ত চলমান আছে। ঘটনাবলির একটি সংক্ষিপ্ত জরিপে দেখা যায়, স্বধর্মত্যাগে অভিযুক্ত অন্যরা এবং অভিযুক্ত অবিশ্বাসীদের আত্মসমর্পণের একটি দীর্ঘ তালিকা ইসলামের ইতিহাসের সবকালেই আছে এবং তা অব্যাহতভাবে বাড়ছে। এখনো মানুষ শপথ নিয়ে কুরআনের দিকে

ফিরে আসছে। নিবেদিতপ্রাণ ইসলামিক স্কলারদের জীবনীগ্রন্থ ও মুসলিমদের ইতিহাস অনুসন্ধান করলে বের হয়ে আসবে মরমি, ধর্মীয় কারণে নির্বাসিত ও স্বধর্মত্যাগে অভিযুক্ত শাস্তিপ্রাপ্ত ফিকাহবিদ, নাস্তিকতা ও ধর্ম হতে বিচ্যুতির অভিযোগে অভিযুক্ত স্কলারদের না বলা উল্লেখ করার মতো কাহিনি। নিবেদিতপ্রাণ স্কলারদের এ দুর্ভোগের নেপথ্যের প্রকৃত কারণ অবশ্যই তাদের সাথে শাসকদের পক্ষের স্কলারদের দ্বন্দ্ব। এ কুখ্যাত আলেমরা দুর্ভোগ থেকে বাঁচার জন্য ক্ষমতার কাছে নিজেদের সঁপে দিয়ে শাসকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও, যদি তারা সবার আগে কুরআনকে আঁকড়ে ধরতেন এবং এতে যা বলা হয়েছে তা থেকে দূরে সরে না আসতে যে-কোনো মূল্যে অঙ্গীকার করতেন, তাহলে মুসলিম সমাজকে শক্তিশালী রাখতে পারতেন। তাহলে অব্যাহতভাবে চলমান কষ্টকর, দুর্ভাগ্যজনক অনেক বিষয় থেকে এ ধর্মটি সুরক্ষিত থাকতো। আল্লাহতায়ালা সবচেয়ে ভালো জানেন। ■

উপসংহার

মানব জাতির বিশ্বাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো তার একটি বিশেষ দায়িত্ব আছে। আল্লাহতায়ালা তাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ যোগ্যতা ও দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাকে সম্পূর্ণ ও অবাধ পছন্দের স্বাধীনতা দিয়েছেন :

> দ্বীন গ্রহণে জোর-জবরদস্তি নেই, সত্য পথ সুস্পষ্ট হয়েছে ভ্রান্ত পথ হতে। যে তাগুতকে অস্বীকার করবে ও আল্লাহর ওপর ঈমান আনবে, সে এমন মজবুত হাতল ধরবে যা কখনো ভাঙবে না। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। (সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬)
>
> ... তোমার কাজ তো শুধু প্রচার করা, আর হিসাব-নিকাশ তো আমার কাজ। (সুরা আর রাদ : আয়াত ৪০)
>
> বলো, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে, সুতরাং যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক ও যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক। (সুরা কাহাফ : আয়াত ২৯)

কুরআনে দু'শর বেশি আয়াতে মানুষের পছন্দের স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করার পর যখন কেউ এ স্বাধীনতার চর্চা করে, তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেয়া অসম্ভব, বিশেষ করে যখন তারা নিজেরা কাউকে আঘাত করার মতো কিছু করেনি। মুসলিম আইনজ্ঞরা (ফিকাহবিদ) যাঁরা স্বধর্মত্যাগের জন্য মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করেছেন, তাঁরা সাধারণভাবে ভিত্তি ধরেছেন তাঁদের সময়ে সংঘটিত কিছু সত্য ঘটনাকে। তাঁরা যে সমাজে ও সময়ে বসবাস করতেন তখন স্বধর্মত্যাগকে উপলব্ধি করা হতো ব্যক্তির বিশ্বাস বদলের সাথে সাথে ব্যাপকভাবে এর প্রভাব মুসলিম সমাজের একজন থেকে অন্যজনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়া, ইসলামের আনুগত্য, এর সাথে সংশ্লিষ্ট জীবনাচরণ, আইন-বিধান ও সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যান করা থেকে। এ ক্ষেত্রে ধর্ম অবিশ্বাস করাকে দেখা

হতো সকল কিছুকে সমানভাবে প্রত্যাখ্যান করার শামিল বলে যার ওপর ভিত্তি করে মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠিত।

এই গবেষণার লক্ষ্য হলো মুসলিমরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে আরো প্রয়োজনীয় কিছু মডেল উপস্থাপন করবে। গুরুত্বের সাথে ইসলামের ঐতিহ্যের পর্যালোচনা করতে আন্তরিকভাবে নিজেদের নিয়োজিত করবে। যখন কুরআন-সুন্নাহর উদ্দেশ্য ও উচ্চ মূল্যবোধ ছড়িয়ে পড়া শুরু হবে এটি হবে আইনগত ক্ষমতা দেওয়ার বাছাই করা শক্তিশালী উৎস যা কখনো নিছক ধর্মান্ধতা থেকে আসা অন্ধভাবে ইসলাম রক্ষার ব্যস্ত প্রয়াস নয়। পরিবর্তে, এটি মুসলিমদেরকে একটি জ্ঞাত উদ্দেশ্যমূলক সচেতনতার হাতিয়ার প্রদান করবে যা ইসলামের শত্রু এবং নিন্দাকারীদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। ■

টীকা

১. স্বধর্মত্যাগ সংক্রান্ত কুরআনের আয়াতসমূহ ২:২১৭; ৩:৮৬; ৩:৯০-৯১; ৩:৯৮; ৩:১০৬; ৩:১৭৭; ৪:১৩৭; ৫:৫৪; ১৬:১০৬; ২২:১১ এবং ৪৭:৩২।

২. সুরা বাকারা : আয়াত ২৫৬।

৩. একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ, ১২ শতাব্দী গোটা মধ্য এবং পশ্চিম ইউরোপ প্রচলিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মের (খ্রিষ্টান ধর্ম) বিরোধীদের তীব্রতা ও তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য পরিচিত। স্পেনিশ রোমান ক্যাথলিক গির্জা খ্রিষ্টধর্ম বিরোধীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করেছিল। রাজা ফারডিনান্ড এবং রানি ইসাবেলা ১৪৯২ খ্রিষ্টাব্দ (দ্য আলহামব্রা ডিক্রি) এবং ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে রাজকীয় ডিক্রি জারি করেছিলেন। এসব ডিক্রিতে আদেশ দেওয়া হয়, ইহুদি এবং মুসলিমদের হয় খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করতে হবে, নয় স্পেন ছাড়তে হবে।

৪. উদাহরণস্বরূপ, ৬:১০৭ এবং ১০:৯৯।

৫. রাসূল সা.-এর সময় স্বধর্মত্যাগকারীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেয়া হতো এ সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট উদাহরণ জানতে এই গবেষণার পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ পড়ার পরামর্শ দেওয়া হলো।

৬. হাদিসের বর্ণনার পরম্পরা এবং স্বধর্মত্যাগ সম্পর্কে দুর্বল হাদিস সম্পর্কে বিশেষ উদাহরণগুলোর জন্য অনুগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ সংস্করণটি অধ্যয়ন করুন।

গ্রন্থ পরিচিতি

'ইসলামে স্বধর্মত্যাগ: একটি ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় বিশ্লেষণ' শীর্ষক গ্রন্থটির মূল রচয়িতা বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ তাহা জাবির আলআলওয়ানি। আরবিতে লেখা মূল গ্রন্থ থেকে *Apostasy in Islam: A Historical and Scriptural Analysis* নামে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন ন্যান্সি রবার্টস।

স্বধর্মত্যাগের (আল-রিদ্দাহ) জন্য নির্ধারিত আইনানুগ শাস্তি কী? কুরআনের ২:২৫৬ আয়াতে বর্ণিত 'দ্বীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই' অনুযায়ী তার প্রতি ধর্ম কতটুকু সহনশীলতা দাবি করে?– এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে গিয়ে লেখক গভীর অধ্যয়ন ও গবেষণা শুরু করেন- যার ফসল এ গ্রন্থ।

গ্রন্থটির আলোচ্য বিষয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও গুরুত্বপূর্ণ। লেখক ইসলাম (বিশ্বাস) থেকে বের হয়ে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড সমর্থন করেন না। তিনি এ গ্রন্থে মৃত্যুদণ্ডের পক্ষের প্রবক্তাদের বিরোধপূর্ণ যুক্তিতর্ক পেশ করার পাশাপাশি কুরআন ও সুন্নাহতে উল্লেখিত সমুন্নত বিশ্বাসের স্বাধীনতার পক্ষে জোরালো যুক্তি তুলে ধরেছেন। যতদিন একজন স্বধর্ম (ইসলাম) ত্যাগকারী বিচারযোগ্য অন্য কোনো অপরাধের সাথে জড়িত না হবেন, লেখকের মতে ততদিন বিষয়টি শুধু আল্লাহ ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

কুরআন একজন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস ত্যাগের পর বারবার ফিরে আসার সুযোগের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে, তাদের হত্যা করা উচিত কিংবা শাস্তি দিতে হবে এমন কথা বলেনি– লেখক এ সত্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কুরআনের নির্দেশানুসারে ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া কারো জীবন নেওয়া সমস্ত মানবজাতিকে হত্যা করার শামিল। সুতরাং, ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের স্বার্থের সাথে জড়িত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা। গ্রন্থটিতে এ বিষয়টিই স্বচ্ছভাবে সবার উদ্দেশ্যে তুলে ধরা হয়েছে।

লেখক পরিচিতি

ড. তাহা জাবির আলআলওয়ানি ১৯৩৫ সালে ইরাকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়রোর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া ও আইন কলেজ থেকে ১৯৫৯ সালে অনার্স, ১৯৬৮ সালে এম এ এবং ১৯৭৩ সালে উসূল-ই-ফিকহ এর উপর ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেন। পেশাগত জীবনে তিনি ১৯৭৫-১৯৮৫ সাল পর্যন্ত সৌদী আরবের ইমাম মুহাম্মদ ইবন সউদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ ও উসূল-ই-ফিকহ্ এর প্রফেসর ছিলেন। এছাড়া তিনি ১৯৮৭ সালে ওআইসি ইসলামিক ফিকহ অ্যাকাডেমির সদস্য ছিলেন।

ইসলামিক জুরিসপ্রুডেন্স সংক্রান্ত তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলী হলো- ইমাম ফখরুদ্দিন রাজির আল মাহসুর ফি ইলম উসূল আল ফিকহ্ [উসূল-ই-ফিক সংক্ষিপ্ত সার] এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত ৬ খণ্ডের বই, আল ইজতিহাদ ওয়া আল তাকলীদ ফি আল ইসলাম। [ইসলামে আইনগত যুক্তি ও অনুকরণ], হুকুক আল মুত্তাহাম ফি আল ইসলাম [ইসলামে অভিযুক্তের অধিকার], আদব আল ইখতিরাফ ফি আল ইসলাম [ইসলামের মত পার্থকের নীতি] এবং উসূল আর ফিকহ্ আর ইসলামি [ইসলামি আইনশাস্ত্রের উৎস পদ্ধতি]। এছাড়াও ইসলামী আইনতত্ত্বের বিশ্বখ্যাত এই সুপন্ডিত বহু গ্রন্থ ও অগণিত প্রবন্ধ লিখেছেন-যা জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

BiiT
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স

ISBN: 978-984-96731-9-4